ঘুমুলে নাকি সাড় থাকে না···

শুধু সাড় ! ষাঁড় বাঘ কিছুই থাকে না বুঝি ।

সেই কারণেই পণ্ডিতেরা ঘুমকে অসার ব'লে থাকেন, কিন্তু আমার মতে, ঘুমই হচ্ছে এই জীবনের সবচেয়ে সারালো জিনিস ।

কিন্তু মশাই বলুন তো, জীবনের সেই সারভাগে যদি কোন ষাঁড় এসে ভাগ বসায়···সেটা কি একটা জীবন-মরণ-সমস্যাই হয়ে দাঁড়ায় না ?

জীবন আমাদের ঘুমুতে ওস্তাদ ! বিছানায় গড়ালো কি মড়া ও । দেখতে না দেখতে ওর নাক ডাকছে—শুনতে শুনতে দ্যাখো !

রাতভোর জেগে জেগে শুনতে থাকো ঐ কাড়া-নাকাড়া !

জীবনকে আমরা সাধলাম—যাবি দেখতে ? শহর থেকে বয়স্কাউটরা এসেছে—ছাউনি ফেলেছে সিঙ্গিয়ার মাঠে—ক্যাম্প্-ফায়ার—আরে কত কি নাকি হবে আজ রাত্তিরে—যাস্ তো আমাদের সঙ্গে চল ।

ঘাড় নাড়লো জীবন—'আমার তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই !'

'কী তোমার কাজ শুনি ? কাল তো রোববার ।'

'খেয়েদেয়ে যা কাজ—ঘুম লাগাবো ।'

হোস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছুটি দিয়েছিলেন আমাদের । রাত দশটার মধ্যে ফিরলেই চলবে । দশ মানেই এগারো—আর যেখানে এগারো সেখানে বারোটা বাজিয়ে ফিরলেও দেখবার কেউ নেই । সুপার কিছুতেই অত রাত অবধি জেগে থাকবে না—ঠিক সময়ে ফিরছি কিনা দেখবার জন্যে । এতগুলো সুযোগ-সুবিধা জীবনে কবার আসে ? আর, সবার সামনেই এগুলো সমভাবে উন্মুক্ত । জীবনের সামনেও উন্মুক্ত করা হলো । শুনে ও খুশি

হয়ে উঠলো—'তোরা কেউ থাকবি নে নাকি? আঃ বাঁচা গেল বাবা! তাহলে তো কোন ঝামেলাই নেই। তোফা একখানা ঘুম লাগানো যাবে।'

সিঙ্গিয়ার মাঠে যাবার পথে দেবীপুরের হাট। ভজুর মাসি বলেছিল সেখান থেকে এক ভাঁড় মধু যোগাড় করতে। সোনালী রঙের চাক-ভাঙা খাঁটি মধু। ভজু বললে যদি তার সাথে যাই তো সে একটু চাখতে দেবে আমায় তার থেকে।

এত মধুর কথা আমি ভজুর মুখে কোনদিন শুনিনি। শুনে মধুর লোভে হোস্টেলের ছেলেদের দঙ্গল ছেড়ে ভজুর সঙ্গ নিলুম। দেবীপুরের শনিবারি হাট তখন ভাঙো ভাঙো। সেই ভাঙা হাটে মধুওয়ালাদের খুঁজে বের করতে সন্ধে উৎরে গেল।

ভজুর মাসি থাকেন কলকাতায়, বোনের গাঁয়ে বেড়াতে এসেছেন—মধুর জন্যেই নাকি! কলকাতায় খাঁটি মধু বিরল। ঝোলা গুড়কে জল দিয়ে আর জ্বাল দিয়ে, ফোটিয়ে ফোটিয়ে আর ফুটিয়ে ফুটিয়ে আরো বেশি ঝুলিয়ে বোতলে ভরে মধু ব'লে চালানো হয়—দেখতে হুবহু মধুর মত হ'লেও তার সোয়াদ নাকি তেমন সুমধুর হয় না।

কে নাকি বলেছে ভজুর মাসিকে, বনগ্রামে মধু মেলে। আর তেমন মধু নাকি কোনখানে মেলে না। তাই বোনকে চোখে দেখার সাথে বন্য মধুর সোয়াদ চেখে দেখার লোভেই বোনের গ্রামে—এই বুনো গাঁয় তিনি এসেছেন।

এক ভাঁড় মধু কিনলো ভজু। আমি বললাম—'কই দে। চাখতে দিবি বলেছিলিস।'

'এখন কিরে? এখন কী? ফরমাসি মধু যে! মাসিমাকে আগে দিই! দিয়ে তার পরে তো? তাঁর জার ভর্তি হবার পর ভাঁড়ের গায়ে যা লেগে থাকবে তার সবখানিই তো আমাদের। তোর আর আমার।'

জারের কথায় আমি ভারি ব্যাজার হলাম—'যা, রেখে দে তোর মধুর ভাঁড় তোর মাসির ভাঁড়ারে। চাইনে আমি চাখতে ফরমাসির মধু তোর for মেসো রেখে দেগে!'

তারপর ভাঁড় ঘাড়ে ক'রে আবার আমাদের যাত্রা শুরু হলো। হাট ভেঙে আমরা সিঙ্গিয়ার পথ ধরলাম।

ক'ষে হাঁটন লাগিয়েছি। কিন্তু কোশের পর কোশ পেরিয়ে গেল সিঙ্গিয়ার দেখা নেই। এদিকে কোশে কোশে ধূল-পরিমাণ! ধুলোর আর পরিমাণ হয় না। পাড়াগাঁর রাস্তা তো?

এর মধ্যে সরু একফালি চাঁদ উঠেছিল। ভজু বললে—'চ, মেঠো পথ ধরা যাক। তাহ'লে আর এই ধুলো ঠেলতে হবে না। মাঠে মাঠে শর্টকাট ক'রে চলে যাওয়া যাবে বেশ।'

মেঠো পথে পা দিতেই চাঁদটাও যেন মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে

লাগলো। এই এক ছিরিক আলো, তার পরেই ঢালাও আঁধার। আলেয়া নেই বটে, তবে আলের গায়ে ঠোক্কর খেতে খেতে নাজেহাল হলাম! একবার তো হোঁচোট খেয়ে নিজের ঘাড়েই গিয়ে পড়লাম। ঘাড়ে মধুর ভাঁড় ছিল, তার চোটে চল্‌কে উঠে জামায় পড়্‌লো। এমন চটে গেলাম নিজের ওপর যে বলবার নয়। চটচটে হয়ে গেল জামাটা।

এমনিভাবে আরেকবার আলের ওপর হুমড়ি খেতে গিয়ে কার যেন গায়ের ওপর পড়েছি।

পড়তেই আমি গাঁক ক'রে উঠলাম।

'ষাঁড়ের মতন চ্যাঁচাচ্ছিস্ যে?' ভজহরি চেঁচায়।

'ও তুই! তোর গায়েই টাল খেয়েছি, তাই বল!' শুশ্রূষার ছলে আমি ওর গায়ে হাত বুলাই। 'যাই বল ভজু, খেয়ে না খেয়ে শরীরটা তুই বাগিয়েছিস বটে!'

আমার কথায় ভজু এবার গাঁক করে।

'ষাঁড়ে মত চেঁচায় না, ছিঃ!' আমি বলি—জাঁক করবার মতন চেহারা পেয়েছিস—পেয়ে আবার গাঁক করছিস? আহা, তোর মতন এমন নধর দেহ যদি আমার হোতো রে ভাই'—বলতে বলতে (আর, বোলাতে বোলাতে) ওর লেজে আমার হাত পড়ে। বেশ লম্বা একখানা লেজ!

'আরে, এ কিরে! তোর আবার ল্যাজ হলো কবে? তুই ল্যাজ গজিয়েছিস —কই তোর লেজের কথা তো কোনদিন আমায় বলিস নি? ঘুণাক্ষরেও না!' —ভজুর লেজস্বিতার পরিচয় পেয়ে হতবাক হতে হয়।

'ষাঁড়ের গোবর তোর মাথায়!' ভজু বলে—গাঁক গাঁক ক'রে।

(কিম্বা বলতে বলতে গাঁকায়।)—'যেমন ষাঁড়ের মতন বুদ্ধি, তেমনি হয়েছে ষাঁড়ের মতই গলা।'

ক্রমে ওর শিঙে হাত পড়তেই টের পেলাম যে ভজু নয়। ভজু ওরফে ষাঁড়। তখন আমি বলি—'আমি না ভাই, একটা ষাঁড়। ষাঁড়টাই আমার মতন ডাকছিলো।'

সেই সময়ে মেঘের ঘোমটা ফাঁক করে চাঁদামামা উঁকি মারেন, আর ষাঁড়চন্দ্র নিজমূর্তিতে দেখা দেন। আমি ভজুকে দেখাই—'এইটেই এতক্ষণ গাঁক গাঁক ক'রে আমাদের ভাষায় কথা কইছিলো। আর এইটেয় হাত দিয়ে—ষাঁড়টার এই সারাংশে—বুঝলি কিনা—আমি ভেবেছি যে, এটা বুঝি তোর ল্যাজ!'

ষাঁড়টা মাথা চালে। নিজের লেজে বারবার পরের হস্তক্ষেপ সে পছন্দ করে না ব'লেই মনে হয়।

ওর মাথার চাল দেখে ভজু আমায় জিগ্যেস করে—'ওটা অমন করে মাথা খেলাচ্ছে কেন রে? মতলব কী ওর?'

'কী খেলছে ওর মাথায় ওই জানে!' আমি বলি—'তবে শুনেছি গুঁতোবার আগেই নাকি ওরা মাথাটাকে অমনি ক'রে খেলিয়ে দেয়—'

'অ্যাঁক্?' ষাঁড়ে মতই এক আওয়াজ, কিন্তু ষাঁড়ের নয়, ভজুর। আমার কথা শেষ হবার আগেই ভজু, কাছেই একটা যে গাছ ছিলো, তার ডালে লাফিয়ে উঠেছে। আমাকে আর বলতে হয় না, আমিও ততক্ষণে আরেক ডালবাহাদুর হয়ে বসেছি দেখতে না দেখতে!

ষাঁড়টা তখন আমাদের কাছ ঘেঁষে আসে—গাছ ঘেষে দাঁড়ায়। গাছের গুঁড়িতে শিং ঘষতে থাকে। আর মাঝে মাঝে ঘাড় তুলে তাকায় আমাদের দিকে। আর গাঁক গাঁক করে।

'মানে কি রে এর?' ভজু জিগ্যেস করে।

'আমরা যেমন ধার বাড়াবার জন্যে ছুরিতে শান দিই নে? ও তেমনি নিজের শিং শানিয়ে নিচ্ছে।

'গুঁ-গুঁতোবে নাকি রে?' ভজু ভয়ে তোৎলা মেরে যায়।

'নি-নি-নির্ঘাৎ!'

'তাহ'লে সারা রাত দেখছি এই গাছের ডালে ব'সেই কাটাতে হবে আমাদের!' ভজু দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে। 'কোথায় সিঙ্গিয়ার মাঠ আর কোথায় এই-ই—য়া শিং! কোথায় বয়স্কাউটের মেলা আর কোথায় এই ষাঁড়ের খেলা! ভাবতে গেলে কান্না পায়!'

'তোর মধুর ভাঁড়টা দে তো আমায়।' আমি ভজুকে বলি 'ওকে একটু মধু খাইয়ে দেখি—যদি ওর রাগটা কিছু পড়ে। মধু খেয়ে মেজাজটা একটু মিষ্টি হয় যদি।'

তাক ক'রে খানিকটা মধু ওর মুখের ওপর ছাড়ি। ষাঁড়টা জিভ দিয়ে চেটে নেয়; চেখেটেখে খুশি হয়েছে ব'লেই মনে হয়। ফের আবার হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে আমাদের পানে। আধ-চাঁদনির আবছায়ায়—আবছা আলোয় স্পষ্ট ক'রে বোঝা যায় না, তাহ'লেও সেটা ওর মধুর দৃষ্টিই যে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তাক করে ভাঁড়টা আমি হাঁকড়ে দিই ওর নাকের ওপর। ভজু হাঁ হাঁ করে ওঠে—'এই এই! করলি কি! মাসিমার মধু যে, অ্যাঁ?'

'মধুরেণ সমাপয়েৎ করলাম। বেঁচে থাকলে বহুৎ মধু পাওয়া যাবে ভাই, আর বিস্তর মাসি। কিন্তু বেঘোরে এখানে মারা পড়ে বাসি হয়ে গেলেও কেউ দেখবে না!'

ভাঁড়টা তাক ফসকে—তার নাক ফসকে—মাটিতে গিয়ে পড়ে। ভেঙে ছড়িয়ে যায় চারধারে। আর, ষাঁড়টা হুমড়ি খেয়ে পড়ে তার ওপর। একহাত জিভ বার করে চাটতে থাকে।

ভজুকে বলি—'আর না! আর দেরি নয়। এইবার যতোক্ষণ ও মধু নিয়ে মত্ত থাকবে সেই ফাঁকে আমরা সটকাই আয়।'

চট করে আমরা গাছ থেকে নেমে পড়ি। নেমেই ছুট!

কিন্তু ষাঁড়ের জিভ যে আমাদের চার ডবল তা কে জানতো? এক লহমায় সে ভাঁড়ের মধু খতম করে—মাঠের টুকুও চেটে নিয়ে আমাদের পিছু নেয়। গোরুদের সঙ্গে আমাদের গরমিল ঠিক এইখানেই। ওরা আলাদা জীব। কোথায় একটা ভালো জিনিস পেলে আমরা ধীরে সুস্থে তারিয়ে খাই, আর ওরা তাড়াতাড়ি খেয়ে তারপরে তারায়—যার নাম নাকি রোমন্থনে—চার পা তুলে আমাদের তেড়ে আসে।

'ষাঁড়টা বোধহয় গুঁতুতে আসছে, না রে—?' ছুটতে ছুটতেই ভজুকে বলি—'মনে হচ্ছে আরো মধু পাবার জন্যেই—'

'তোকে বলেছে!'

'এক ভাঁড়ে আর কী হবে ওর! এক জালা হলেও কিছুটা হোতো না হয়—'

পড়ি কি মরি ক'রে ছুটেছি। এটাকে, কবির ভাষায় বলতে গেলে, 'আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে চন্দ্র ডোবে ডোবে! ষাঁড় ছুটেছে পিছু পিছু মধুর লোভে লোভে।' ছুটতে ছুটতে আমরা হোসটেলের এলাকায় এসে পড়লাম। তখনো কিন্তু পাষণ্ডটা পিছু ছাড়েনি।

'কী হ্যাংলা ভাই!' ভজু না বলে পারে না—'এমন আদেখলে ষাঁড় আমি জন্মে দেখিনি।'

আমি বললাম—'দাঁড়া, ষাঁড়টার সঙ্গে একটা চালাকি খেলা যাক' বলে, হোস্টেলের গা-লাগা যে চালাঘরে আমাদের কয়লা ঘুঁটে ইত্যাদি মজুত থাকতো, ভজুকে নিয়ে আমি তার ভেতরে গিয়ে সেঁধুই। বলা বাহুল্য, ষাঁড়টা সেখানেও আমাদের অনুসরণ করে। কিন্তু ঢুকেই না, আমরা ওদিকের জানালা দিয়ে গলে বেরিয়ে এসেছি বাছাধন সেটি আর টের পায়নি—বাছুরে বুদ্ধি তো! বেরিয়ে এসে আমরা এদিক থেকে বাইরের শেকল তুলে দিই—'থাকো বাবা, যাবজ্জীবন কারাবাসে—আজ রাত্তিরের মতন!'

ষাঁড়কে শৃংখলিত করে আমরা শুতে যাই। কিন্তু শোয়া—ঐ নামমাত্রই! ঘুমের দেখা নেই। মুহুর্মুহু কানে যেন শূল বিঁধতে থাকে। বাপরে ষাঁড়টার সে কী ডাক! সিংহনাদ কখনো শুনিনি, কিন্তু ষাঁড়ের নাদ তার কোনো অংশে খাটো নয়, সেকথা আমি হলপ করে বলতে পারি।

আটচালা ফুঁড়ে, হোস্টেলের পাকা দেওয়াল ফুটো করে আসতে থাকে সেই ডাক। জীবন দুর্বিষহ করে তোলে (তখনও কিন্তু জীবন-দুর্বিষহের সবটা আমরা টের পাইনি!)।

ভোরে উঠেই প্রথম কাজ হলো ষাঁড়টাকে বার করার—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ওঠবার আগেই। হোস্টেলের বাচ্চা চাকরটাকে ডাকলাম। তাকে আমরা মোষের পিঠে চড়ে বেড়াতে দেখেছি—অমন মোষের যে পৃষ্ঠপোষকতা করতে

পারে সে কি আর তুচ্ছ একটা ষাঁড়ের মোসাহেবী করতে পারবে না? মিষ্ট কথায় তাকে তুষ্ট করে, কি গায়ে হাত বুলিয়ে, কি যা করেই হোক সামান্য একট ষাঁড়কে সায়েস্তা করা তার পক্ষে এমন কী?

'এই বংশী, চালাঘরের মধ্যে একটা ষাঁড় ঢুকে বসে আছে তাকে কায়দা করে বার করতে পারবি?'

'আট আনা হ'লে পারি।'

ভজু বললে, 'দু আনা।'

বংশী।—না, আট আনা।

আমি।—দশ পয়সা।

বংশী।—আট আনা।

ভজু।—চার আনা।

বংশী।—না বাবু, আট আনা চাই।

আমি বললাম—নারে, না, মোট-মাট সাড়ে চার আনা পাবি।

বংশী।—আট আনা। (বংশীর সেই এক কথা।)

ভজু। ছ'আনা—

আমি। সাড়ে ছ' আনা— আস্তে আস্তে বাড়ানো আমার।)

ভজু যেন হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে বলে উঠলো—না না, আনাই। আট আনাই দেব, কিন্তু ষাঁড়টাকে বার করা চাই—

বংশী তখন লম্বা একটা বাঁশ নিয়ে এলো। তারপরে আটচালার পেছনে গিয়ে জানলা গলিয়ে সেই বাঁশ দিয়ে খোঁচাতে লাগলো ষাঁড়টাকে।

বংশী আর বংশ দু'জনে মিলে কি করলো তারাই জানে, একটু পরেই আমরা চালাটার এধার ফুঁড়ে একজোড়া শিং বেরুতে দেখলাম, তারপর সেই শিংয়ের পিছু পিছু গোটা ষাঁড়টাকেই বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। লেজ আর আওয়াজ একসঙ্গে তুলে—শিং নাড়তে নাড়তে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলো পাষণ্ডটা। বেরিয়েই আর কোনো ধার না তাকিয়ে দুদ্দাড় এক ছুট লাগালো মাঠের দিকে।

আর আমাদের বংশী, সবংশে, ছুটলো তার পিছন পিছন—সে দৃশ্য দেখবার মতই।

কিন্তু এসবেরও বড়ো আরেক দ্রষ্টব্য ছিলো—সেটা দেখা দিল তারপরেই।

জীবন আমাদের বেরিয়ে এলো চোখ রগড়াতে রগড়াতে। ঘুঁটের ঘাঁটি সেই আটচালার আড়ত ভেদ করে। শিং দিয়ে ষাঁড়টা যে দরজা বানিয়েছিলো—সেই সিংদরজা দিয়ে এলো আমাদের জীবন। ষাঁড়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

'অ্যাঁ, তুই কি ছিলিস নাকি রে ওর ভেতর? ওই আটচালায়—সারারাত? অ্যাঁ?' অবাক হয়ে আমরা জীবনকে দেখি। আমাদের জীবনের অষ্টম আশ্চর্যকে।

'এই কি তোর ঘুম ভাঙলো নাকি রে ?' ভজু ওকে শুধোয়।

'ঘুমুতে পেলাম কোথায় ? আরামে যে একটু ঘুমুবো তার যো কি !' চোখ মুছতে মুছতে জীবন জানায় : 'যা ঝড়বৃষ্টি গেছে কাল রাত্তিরে ! যত না বিষ্টি তার চেয়ে ঝড়—যতো না ঝড় তার ঢের বেশি মেঘের ডাক !'

'মেঘের ডাক—বলিস কিরে ?'

'বলছি কী তবে ? ভাবলুম যে, তোরা নেই, কোনো ঝামেলা হবে না। আরামে ঘুমুনো যাবে। কিন্তু হোসটেলে কি তোরা ঘুমুতে দিবি ? এগারোটার সময় ফিরে এসে হৈ-হল্লা লাগাবি সবাই—আমার সাধের ঘুমটাই মাটি করবি তখন। তাই ভাবলুম তার চেয়ে চলে যাই আটচালায়—কাঠকুটরো সরিয়ে—ঘুঁটেদের সরিয়ে হটিয়ে—মজাসে ঘুম লাগাই গে একখান !'……

'তা তোর বেশ ঘুম হয়েছিল তো। ঘুমিয়েছিস তো ভালো করে ?'

'টের পাসনি কিচ্ছু ?' ভজুর কথা আমার কথার পিঠেই।

'ঘুম ? তা, ঘুম একরকম হয়েছে—কেন, কী টের পাবো, বলতো ?' সে একটু অবাক হয় !

'এই—এই একটু ইতর-বিশেষ ?' ভজু একটু ঘুরিয়ে বলে—'কারো হাঁক ডাক ?'

'বললাম কি তবে ? ঝড়বিষ্টি কি কম গেছে কালকে ? আর, কী বাজ-পড়া আওয়াজ রে ভাই ! আর ঝড়েরও কি তেমনিই দাপট ? হাওয়ার চোটে একগাদা ঘুঁটে এসে পড়েছে আমার ঘাড়ের ওপর—কখন যে, তার কিচ্ছু আমি টের পাইনি। সকালে উঠে দেখলাম সারা গায় ঘুঁটের লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি। কিন্তু আওয়াজটা যা ! বাপস্ ! ঘুমের মধ্যেও হানা দিয়েছে আমায়। রাতভোর কী কড়াক্কড় ! এমন মেঘের ডাক জীবনে শুনিনি !'

জীবনের ঘুমকাহিনী (কিম্বা ঘুমের জীবনকাহিনী) হাঁ করে শুনি আমরা !

Ghumer Bohor by Shibram Chakrabarty

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com